প্রকাশক : শম্ভু রক্ষিত
মহাপৃথিবী
১১, ঠাকুরদাস দত্ত ১ম লেন,
হাওড়া —১

মুদ্রাকর : বিশ্বকর্মা প্রেস
২/১ এ, আশুতোষ শীল লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : প্রকাশ কর্মকার

গ্রন্থস্বত্ব : অঞ্জলি দত্ত

প্রথম প্রকাশ : ২৭ জানুয়ারী, ১৯৫৯

শৈলেনকুমার দত্তের অন্যান্য বই

কবিতা

অমৃতে অথৈ   খেলাঘরের রাজা   পুশকিনের প্রেমের কবিতা (অনুবাদ)

ছোটদের

কিচির মিচির (শিশু সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)   খোকাখুকু
উলুকুট ঢুলুকুট   আমপাতা জোড়া জোড়া   ভারত আমার
আয় রে পাখি   জানোয়ারের মেলা   হালুম হুলুম
মাছের ঝাঁপি   ফলের ঝুড়ি   ফুলের সাজি
ছড়ায় পড়া (১+২)   পরিবেশ গড়ি বেশ   কাটুম কুটুম
আইকম বাইকম

ডোরাকাটার মুখোমুখি   গবুচন্দ্র রাজার নবুচন্দ্র মন্ত্রী   কৃষ্ণকান্তের হুইল
রঙিন পালক

অন্যান্য

বিস্মৃত-প্রায় বাংলা কাব্য   বিস্মৃত প্রতিভা, বিলুপ্ত পটভূমি
যোগীন্দ্রনাথ বসু   জীবনীকারের জীবনী
রসাল কথা   কবিপ্রিয়া
গল্পকারের গল্প   মনীষী জীবন ও বিচিত্র প্রসঙ্গ
সাধারণ অসাধারণ (১+২)   মনীষীদের ছেলেবেলা
মনীষীদের মা   মনীষীদের প্রেম
মহাজীবনের হাস্য-পরিহাস   মহাজীবনের মণিব—

সূচীপত্র

মা-কে

একই মাটি অম্বুর ও তৃতীয় নয়ন
একই শব্দ অশ্রু ও কুসুম
একই প্রেম বিষ ও প্রতিমা
আর তুমি একাকার
উল্লাসে হাহাকারে

সীমানা

সুখের কথা ভাবলে আমি জননীর মুখ দেখি
মলিন বসন গায়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছে ভারতবর্ষ
আঁচলের ধুলো থেকে অন্তহীন স্নেহ
প্রগাঢ় উত্তাপ ঢাকা সুশীতল ছায়া
হাত থেকে বরাভয়, অন্ধকারে অকম্পিত শিখা

পৃথিবীর এত ফুল ! আমি ন্যুব্জ তার ভারে
গৌরবে প্রশস্ত হাত, দুটি চোখে বিমূর্ত আশ্রয়
ধ্যানেতে দিয়েছে দীক্ষা
রক্তেতে কখন যেন বুনে গেছে প্রেম !

যতটা ছড়াব আমি, তাই হবে জননীর সীমা…

কবে একা

কিছুই ভুলিনি আমি, কবে কার হাত ধরে
পৃথিবীর পথ হাঁটি, কবে কীসে ভয় পাই
কবে আমি দেখেছি আগুন। আগুনের কাছ থেকে
মোরগফুলেরা লাল, কবে হাতে দিয়ে গেছে
গোপন আগ্রহ।

কিছুই ভুলিনি আমি, কবে ছিল বিনিদ্র প্রহর,
পুরোনো জামার গন্ধে চিনেছি পুরুষ
কবে চোখ বিদ্রোহের, কবে কার শুশ্রূষায়
পাথরের বুক চিরে তুলেছি পানীয়।

তবে আর মনে নেই—কবে ভেঙে চুরমার
অন্ধকার একাকী রাতে কবে ঘোরে চলে গেছি
নদীটির কাছে।

অন্য পায়ে

এক পা ওপরে রাখি, পা, না কি উজান নৌকো।
রাণীর বাগানে ডাকে ভুতুম নিঃশ্বাস।
সামনে কি বাতি-চর। সেতু জানে গতিপথ
সেতু বোঝে পদচিহ্ন—ক্ষুধার, প্রেমের

এক পা মাটিতে গাঁথা, গৃহস্থের দায়
অন্য পায়ে মর্মরিত সেতুর ওপার…

কীভাবে

সম্পদে আমার কোনো আকর্ষণ নেই
সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি যৌবন,
এত ঐশ্বর্য আমি ধরে রাখব কীভাবে।

হিম ঝরা মেঘে আমি এগিয়ে চলি পথ—
থমকে দাঁড়াই, মিথুনের কাল
পোড়োবাড়ির অন্ধকারে যুবক-যুবতীর উষ্ণ হ্রেষা
আমি পেরিয়ে যাব কীভাবে।

দাহ

আগুনে ডুবেছি আমি, দূর থেকে আরও দূরে
সরে গেছে ছায়াতীর, দহনে ভাসিয়ে গেছি ভেলা।

পাথরের নটরাজ, তুমি কি ভ্রূভঙ্গতালে
কাঁপাও আমাকে!
অবিকল প্রজাপতি, তুমি কি দুচোখ তুলে
আমাকে গোপন ডাকে পাঠাও উত্তাপ!

আগুনে ডুবেছে দেহ, দাহ গেছে অনেক গভীরে
প্রিয় নারী শুয়ে আছে, ভেঙেছে সে পুরোনো খোলস।
জলছবি ভাসমান—প্রিয় থেকে প্রিয়তর মুখ
আহত রাগিণী বাজে
আগুন কি ফোটাবে কুসুম!

বয়স

দৃশ্যই পাল্টে গেছে!   সেদিনের নটনটী ন্যুব্জ দেহে
দর্শকের ভিড়ে, তবু কী অসীম টান।
প্রসারিত ব্যাস আজ ভিন্ন বৃত্ত পার হয়ে
হৃদয় গভীরে

আদিম তেতেছে রক্ত, জ্বলে কপালে ত্রিপুণ্ড্র, ধ্বনি—
ধূসর পাতার দেশে আজ সেরা কলরব, মাদলের হাসি
বাতাসে মাংসের গন্ধ
ঝলসানো রুটি আর মদ

থেমেছে খননকার্য, উঁকি দেয় সাজঘর
উদ্দাম অরণ্য জুড়ে রমণীর গোপন আফ্রিকা!
সারা দেহ লবণাক্ত, ব্যাধের পিঙ্গল চোখ
তবু বদ্ধ কুসুমের দিকে
আজ নাকি থেমেছে সময়।

নিরুদ্দেশ

মদের গেলাসে একটা রঙিন প্রজাপতি, তাই নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড !
সামিয়ানা-রোশনাই বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি
মন্ত্রীর চকচকে ভুঁড়িতে কা করে মাছি পেছলায়
তার গবেষণাপত্র জমা দিয়েছে বিখ্যাত এক আমলা
রক্তদান শিবিরের ফিতে কাটছে কসাইখানার সভাপতি
আর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে
হাঘরে ছেলেটা মাটি খুঁজছে

এই মসৃণতায় কোনো যুবক নিরুদ্দেশ হবে…

উদ্বেগ

কাল সন্ধ্যায় তরুণ বন্ধু এলেন,
সঙ্গে দুজন সৈনিক।
অসমান উচ্চতার দুই জঙ্গী, চোখে ধারালো বর্শা—
আর কথাবার্তায় কাঁচা মাংসের গন্ধ

আত্মরক্ষার সুযোগ নিতে দেয়নি ওরা
অদৃশ্য তলোয়ারে ফালা ফালা করে গেছে হৃদপিণ্ড

হা-হা করে আটচালা—
আমি জ্যোৎস্না মাখার গৌরব কোথায় রাখব গোপনে!

মুদ্রার ওপিঠে

দেওয়ালের ফাটল জোড়া দারিদ্র্য, হলুদ পায়ের পাতা
ফ্যাকাশে শালিক, কনকনে হিমঘর—তবুও রমণী ছিল
অনীক আগুন, লকলকে শিখা তার তরুণ সংসার

তির্যক আলোয় ছেঁড়ে মাকড়সার জাল, ক্রমশ জিরাফ হয়
দুঃখের আঁচল টানে রাংচিতা
পুরোনো চিঠির রাশি, উড়ে যায় দীর্ঘশ্বাস

একটি একটি করে সিঁড়ি ভাঙি—অশ্রুর আকাশ
মুদ্রার ওপিঠে কি আজও আছে পুরোনো উত্তাপ!

আমাদের দিন

আমাদের নিহত দিন এলোমেলো নিবিড় বিহ্বল
পৃথিবী তর্জনী-বিদ্ধ, কখনও প্রগাঢ় সেই তুমুল উল্লাস !
চকিত ঠিকানা লেখা নির্জনতা, গলি—গাছতলা লোকসভা
দড়িলাফ ডিঙিয়ে যাওয়া দিন, কখনও বা বুকভারী
পরাজিত মানুষ কিংবা দুধসাদা ফ্রকের কিশোরী

আমাদের মায়াবী মেঘরঙ্ সেই প্রেম ! পেখম ছিল না তাই
ছড়ানো বৈরাগ্য । গুপ্তঘাতক খাতা থেকে কাঁচা কবিতার পাতা
নির্জন আগুনে, মুখোমুখি বিষণ্ণ অলীক এক আলো

নাভিকুণ্ড আজো আছে
দিয়ে যাব দূরের নদীকে…

যেতে পারি

বারান্দায় সূর্যের উঁকি, শাদা বেড়ালের থাবা ছুঁয়ে
লম্বা হাত বাড়িয়েছে রোদ, আমি গোপন রাখতে চাইছি
কেন না ওই আলোতে উন্মুক্ত হতে পারে প্রেম ও কলম

সূর্য উত্তপ্ত হয়, গাছেরা চটপট রান্না সারে
কাঁথা শুকোয় নতুন পোয়াতী, আর খিল খিল হাসি ওড়ে
এক ঝাঁক টিয়াপাখি—

ওদের কাছে কি ফাঁস হয়ে গেছে মন্ত্র।

এরকমই একটা ষড়যন্ত্র ভেবে আমি সন্ত্রস্ত হই
সূর্যকে মিনতি করি—আমাকে আড়াল রাখতে দাও
দেখো আমার পোশাক তৈরি,

আমি যেতে পারি অন্ধকারে—

আবার উত্তাপ দাও

বৃদ্ধের সান্ধ্যভ্রমণ—বিলম্বিত পদক্ষেপ, সুচারু বিন্যাস
চাদরে অতীত তার গোলাভরা ধান, দেশভাগ
রাজধানী উত্তাল করা উজ্জ্বল বারুদ

এক এক অধ্যায় জুড়ে মহামারী, মন্বন্তর—
মেরুদণ্ড সোজা করা দুর্লভ মানুষ! কখনও ছায়ার নিচে
প্রাচীন গম্বুজ, বাজুবন্ধ খাট থেকে সাজানো বজরা
ছেটানো জলের ফোঁটা নিভাঁজ আশ্বিন

সরোবর পার হলে গভীর ভ্রূকুটি, জড়ানো গর্জন
হেলে পড়ে অতীত, কুয়াশার মুখ ছেঁড়ে অন্য এক আলো।
শিথিল শিরার কণ্ঠে কম্পিত প্রার্থনা—আবার উত্তাপ দাও,
পা রাখব ঈশান-নৈঋতে···

প্রেমিক

বিদ্ধ যদি করো তবে পেতে দি হৃদয়
প্রেমের অনন্ত শয্যা, সুতীক্ষ্ণ শায়ক দিয়ে
খান খান করে তোলো পলাশ-শিমূল
ছিন্ন করো লোকাচার, প্রেমের আগুনে পুড়ি
সারা দেহে অগ্নিস্নান হোক।

কী আছে জানতে চাও। আছে নম্র ভূমিশয্যা
খেলাঘরে থরে থরে সাজানো আহ্লাদ।
ভাঙচুর হবে বলে কানাকানি, ফিসফাস
জল নিয়ে নিরন্তর খেলা

অনন্ত শয্যার প্রান্ত ধরে আছি এক হাতে
ওই দিকে কার মুখ! আসঙ্গ প্রেমিক।

ছায়া

যখন আগুনে মুখ দেখি—
মুখ ঝলসায়, চোখে ছায়া পড়ে
লেলিহান শিখার

যখন জলে মুখ দেখি—
মুখ ভিজে যায়, চোখে প্রবাহিত
বুক চেরা নদী

যখন দর্পণে মুখ দেখি—
মুখ কাঁপে, কুটিল ভাঁজ দেখে
নিজেই ভয় পাই…

আমার প্রতিমা

আমি তো প্রেমিক শুধু, তবে কেন নারী দেখে
প্রতিমা সাজাব
যাকে আমি ছুঁতে পারি, কেন তাকে দেবী করে
তুলে রাখি কাঠের চৌকিতে।
পারি না কি রেখে দিতে মাটির বেদীতে!
ঢেলে দিতে সব রক্ত
আলতা-সিঁদুর দিয়ে গড়ে নিতে আর এক প্রতিমা!
যার কাছে আলো পাব ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে
উষ্ণতার খোঁজে যাব গহন অতলে।

দেবী না, মানবী হোক আমার প্রতিমা
ভিক্ষা দাও অন্নজল, লবণের দানা…

জলের প্রহর

বুকের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে নদী, শৈশবের অজয়-দামোদর
এখনও অবাধ্য খুব—নাক ঠেকালে মাটি-গন্ধ !
তিস্তা-তোর্সা যৌবনে গেয়েছিল অরণ্য
খাদ্য আর দুই কষে গড়ানো আগ্রহ

দূরে দূরে অনেক আত্মীয় বিপাশা-গোমতী-নর্মদা
পরস্ত্রীর চুলের ঘ্রাণ দিয়েছিল যমুনা
কৃষ্ণা-কাবেরী গার্হস্থ্য ভাস্কর্য
বিকেলের সিঁদুর মেখে সুবর্ণরেখা লাজুক হেসেছিল
আর জটাজুট ব্রহ্মপুত্র ভয় দেখিয়েছিল
পথ আটকাবে বলে

ডানিয়ুব-রাইন-টেমস নীল-আমাজনও খোঁজ নেয়
বলি—সুখে-দুঃখে আছি, শুশ্রূষার হাত ধরে
জলের প্রহরে···

বিষ

এক দিন সব তারা নিকট আত্মীয়, নক্ষত্রের হাত ধরে
সমগ্র আকাশ। নিচে সেই খেলাঘর, হাসি আর হাহাকার
নিয়ত সূর্যের কাছে অশনি-প্রার্থনা

ক্রমশঃ প্রকট সব দুর্বলতা, ভিতের কোন্ অংশ ফাঁপা
সতর্ক দর্পণে কই মানুষের ছায়া। নদীর সঙ্গে আড়ি
পাখিদের খুনসুটি নেই
দুএকটি চটুল বেড়াল

ধূর্ত বণিক মগ্ন শয্যাপ্রান্তে, ভস্ম থেকে আর্তনাদ—
আহা দেখো, সন্ধ্যাতারার সঙ্গে অম্বুকের কত ভাব !
আর সেই দুঃখটুকু ধুতে গেলে নদীও বিমুখ
ওগো নারী।   বিষ দাও, কী হবে অমৃত !

মরচে-পড়া তলোয়ারের গল্প

আমি গতজন্মে ভূস্বামী জমিদার ছিলাম
শাসন-শোষণ কোনোটাই করতে পারিনি
তাই আবার আমার জন্ম…

উন্মুক্ত প্রান্তরে বাঁধা থাকত আমার ঘোড়াগুলি
তারা জ্যোৎস্নায় ঘাস খেতো, আর আমাকে শোনাত
তেপান্তরের গান
আমার নাচঘরে দ্রৌপদী ছিল, তারা প্রজাপতির ডানা ছিঁড়ত
আর আমাকে বাড়াত তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের তর্জনী
সেই লবণাক্ত স্বপ্নের জন্য আবার আমার জন্ম…

আমার তলোয়ার ছিল মরচে-পরা
আমি কোনো দিন যুদ্ধ জিতিনি
সেনাপতি কৃষ্ণ আমাকে নিয়ে যেতো বেণুবনে
সেই মরচে-পরা তলোয়ারের গল্প শোনাতে
আবার আমার জন্ম…

সেতু

মাঝখানে পর্দা আর অন্তরালে আলোর রহস্য—
ভুতুড়ে বাতাস এসে নিয়ত ছড়িয়ে দেয় অলীক সংলাপ

নির্বাচিত কুশীলব, পর্দার ওপারে তারা দলবদ্ধ একাকার
হাসিকান্না, যত কিছু কারুশিল্প সুচারু মিছিল হয়ে
হেঁটে যায় পাশাপাশি, দিন নেই, রাত্রি নেই—
অনন্ত প্রান্তর জুড়ে ফুটে ওঠে আকাশ-কুসুম !

সকলে এগিয়ে যায়, একটাই গতিপথ—
থেমে যায় হাত নাড়া, কোলাহল, তর্জনীর সুতীক্ষ্ণ সংকেত।
নিথর নৈঃশব্দ্য এসে আলিঙ্গন করে, আকণ্ঠ চুম্বন

অস্পষ্ট আলোর বুকে ভেসে ওঠে আদিগন্ত সেতু···

ঘ্রাণ

মধ্যরাতে কেউ নেই, লম্বিত পর্দায় শুধু
অগণিত মুখ।
নিজের শৈশব থেকে বেছে নেওয়া দুএকটি অধ্যায় !
হারানো ফুলের গন্ধ, অনুরাগ প্রত্যাখ্যান
কিছু কিছু মুছে ফেলি, অন্তরালে ঢাকি মুখ
শ্মশানে পিতার শব, মায়ের অস্পষ্ট স্মৃতি
ছিন্নভিন্ন, তোলপাড়, অস্থির, মধুর···

দেহের গভীরে খুঁজি প্রবাহিত নদী
কোথায় লুকোনো চর, যেখানে রক্তের রঙে
গড়াবে কবিতা ! বুক ভরে ঘ্রাণ নেব—
অনন্ত বাসর।

গাথা

ভোজসভায় সবাই নিমন্ত্রিত। কেউ বিষণ্ণ, কারও
প্রগলভতায় ভরে ওঠে মঞ্চ, কেউ কেউ
উদাসীন ভঙ্গিতে ছুঁয়ে যায় গভীর যন্ত্রণা।

হা-হুতাশ করেনি কেউ। মাতাল লণ্ঠন শুধু
জুগিয়েছে রাতের মদিরা, বিবেচক সময় ঠিক
শেষলগ্নে জানিয়েছে বিদায়-প্রতিমা।

এসব প্রহর শুধু জেগে ওঠা, ভেঙে পড়া স্রোত!
তবু বীজ ঝরে পড়ে কারও গর্ভে
পরাস্ত হৃদয় কারও অপেক্ষায় থাকে
কারও কারও ঘন্টাধ্বনি বেজে ওঠে বেদনা-পূরবী!

পাখি এসো, নদী এসো

পাখি এসে বলেছিল এসময় বড়ই নির্মম!
সবুজ পাতার দেশে এসেছে হলুদ রোগ
অসুস্থ বৃক্ষের চোখে তাই বড় ভয়।

নদী এসে বলেছিল মেঘেরা উধাও আজ
এই বেলা খুলে দাও সবার নোঙর।
ওপারে কি হেঁটে যায় সুখের ফেরারী!

পাখি এসো, নদী এসো, দেখে যাও আমরা এখানে
কীভাবে রঙিন ঘুড়ি রেখেছি আকাশে…

স্বরলিপি

এখনও একান্ত হলে ছুঁতে পারি অস্পষ্ট দুচোখ।

এক একটা বছর গেছে, জমেছে দেওয়াল জুড়ে
এলোমেলো ছবি। ছবি থেকে উঠে এসে
কেউ কেউ কথা বলে। অকাতর রাত্রি তার
বুকের বোতাম খুলে দেখায় প্রতিমা।

সমস্ত অর্গল ভাঙে। সে তখন কাছে আসে
কবিতাকে ভেঙে দেয়, অসহ্য কম্পনে আঁকে মুখ।

সময়, তুমি কি আর স্বরলিপি জানো!

ঠিকানা

রাত্রির রহস্য আর পরিয়েছি কাঁচপোকা টিপ
করতলে মুদ্রা তবু দেখায় ভ্রূকুটি!
আমি যদি সে শাসন গিলে ফেলি,
নীলকণ্ঠ হই—
তুমি এসে নিকট দূরত্ব থেকে
হাতে দাও এক খণ্ড রুটি
আমি সেই ঠিকানাটা চিনি…

সময়

মেলা যেই ভেঙে গেল, ব্যাপারী পশরা হাতে
সুচতুর দৃষ্টি তার অবনত, কেমন চঞ্চল !
জনশূন্য ভাঙা হাট, শালপাতা ছত্রাকার
আনন্দপ্রহর শুধু হেঁটে যায় পিছনের দিকে।

এই তো সেদিন ছিল, ঝলমলে ঘেরাটোপ !
বিষণ্ণা রমণী ঠায় দাঁড়িয়ে দর্পণে—
কোথা সে কোমল টান ! ছিল যা দুচোখে অাঁকা
নিস্ফল প্রয়াসে ব্যগ্র দীর্ঘায়িত হাত—
কে যেন ঠেলেছে এই শূন্যতার মাঠে !

বৃথা কি আগলে রাখা, যা যা ছিল এত দিন
সতর্ক প্রহরী ঠাসা ! দুর্গের সার্সি ভেঙে
হা-হা শব্দে একা শুধু হাসছে সময় !

সন্ধি

ছেলেটি মাটির ওপর দাঁড়াতে চেয়েছিল,
কেউ তাকে দাঁড়াতে দেয়নি।
অভিমানী যে-কিশোরী ঢেলেছিল বিষ
সে জানতো না, বহুদিন অভুক্ত থেকে
ছেলেটি খেয়াল বশে ছুঁড়েছিল ঘৃণা।

ছেলেটি প্রেম পায়নি, দৃঢ় পায়ে ভর দিয়ে
হাঁটতে চেয়েছিল শক্ত মাটিতে,
কেউ তাকে হাঁটতে দেয়নি।

সমস্ত ভিজে বারুদ ফেলে দিয়ে তাই
ছেলেটি আজ সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ছবি

কবির চোখে আমি স্বর্গের ছবি দেখি—
পারিজাত ফুল, মানুষের সিংহাসন
রক্তমাংসের গন্ধ, দুর্লভ নির্যাস।

কবির চোখে আমি পুরুষের ছবি দেখি—
নিষ্পাপ সবল দেহ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রেম
মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে শস্যবীজ নিয়ে।

কবির চোখে আমি রমণীর ছবি দেখি—
গহন অরণ্যে-বাঁধা চুল—জ্বলজ্বলে টিপ
আঁচলের আড়ালে রাখা যন্ত্রণা।

অশরীরী

এতটা চলার পথ, সঙ্গী শুধু দীর্ঘ সরোবর।
হাতে যে বাতির আলো তার চোখে অনেক জিজ্ঞাসা।
কীভাবে কেমন করে চিনে গেছে সেই নারী
আমি দেখি অবয়ব, তবু তার রক্তমাংস নেই

আরও তো বিস্ময় ছিল, একটি বাদশাহী মোহর
সেদিন দেখাল মসনদ, স্নানঘর, চিককাটা নম্রভাব
উড়ন্ত রুমালে লেখা ছিল তার শুভনাম,
গোপন উচ্চতা

আমি তাই অন্বেষণে যাব···

রাজা

কবিরা একে একে মঞ্চে এলেন। অবাধ কবিতার মজা
এলোমেলো চুল, মুখেতে বুদ্ধির দীপ্তি
অহংকারী চোখ, মুঠোয় ধরা যেন একার পৃথিবী।

জমাট মৌতাতে চা-কফির সঙ্গে সিগারেট-পান
এবং আরও কিছু অন্তরঙ্গ বিস্ফোরণ।
এই করতে করতে আস্তিন গুটিয়ে কিছু কবি
আসরে ছড়িয়ে দিল উজ্জ্বলতা

সার্সি ভাঙল না, আয়নার সামনে ভ্রূ কাঁপল না
কিশোরীর, তবু এক রাজত্বের কিনারে এসে
হাত তুলল সকলে, জয়লাভে—

স্তোকবাক্য

পথ চলতে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়
তাদের ভ্রূকুটিতে বোঝা যায় কোন্‌ সময়ের।
দুহাতে জমানো প্রেম—না, নাটকের গভীর অংকে
হাততালি দেবার জন্য প্রস্তুত

যারা কাছাকাছি সময়ের, আমারই মত পথের পাঁচালী
সুচিত্রা-উত্তম, কিংবা মহালয়ার রোমশ ভোরে
গঙ্গামাটি নিয়ে খেলা করত—
তারা তির্যক হানে

আগুপিছু মাপামাপি হয়

এই সব বন্ধুদের কাছে স্তোকবাক্য দিতে গিয়ে দেখি
ওরা সবাই জানে—
পৃথিবী অঙ্কে কখনও ফেল করেনি···

রূপকথা

কারা কারা পথ বেয়ে চলে গেছে, পদচিহ্ন
চেনা যায়, দেওয়ালে অজস্র লিপি ইস্তাহার
কেউ কেউ বেড়া ভাঙে, কেউ গাঢ় প্রেম চায়
কেউ শুধু সহবাস, কেউ যুদ্ধ, নিয়ত সংগ্রাম

সব যুগে ব্যাধি ছিল, ভ্রষ্টাচার, অশান্ত সময়
হতাশায় ম্লান হাসি, তবু আলো অন্ধকার চিরে
পাঁক থেকে পদ্ম আর পদ্ম থেকে পাঁকে ফিরে আসা

সবারই শৈশব থাকে, অবিরাম পিছু ডাকা
শিশিতে আরক নেই, তবু গন্ধ শিকড়ের টানে !
এসব পেরিয়ে যদি খেতে বসি, ঠাণ্ডা ভাত
পুরোনো মাছের ঝাল, অপরূপ রূপকথা !

বালকের মুকুট থেকে হাত নাড়ে অজস্র পালক···

ওগো সুখ, অপরূপ

বাতাসে ভাসছে বিষ, মাটির মমতা ছেড়ে
উড়ে গেছে সব পাখি, প্রতিবেশী গাছ কবে
অভিমানে ক্ষয়ে গেছে, জননীর হাত টেনে
কারা গেছে হা-হা শব্দে বেলা-অবেলায় !

শিশুর নিটোল গাল, তার থেকে ঝরে গেছে
শৈশব সুষমা, কচি হাতে ধরা সেই আগুন কুসুম !
রঙিন ভেলাটি কবে অন্ধকারে ডুবে গেছে, বালিকার পবিত্রতা
দেবতার বৃন্ত থেকে গড়াগড়ি আম বনে, নির্জন প্রহরে

এভাবে কি যাবে দিন ! সকলের এক প্রশ্ন
অথচ সকলে চায় হাহাকার থেমে যাক
রমণীর ভেজা চুল, সারা অঙ্গ ছায়া দিক
এক মুঠো ধান দিয়ে গড়া হোক অমল প্রতিমা ।

সবারই নিঃশ্বাস পড়ে—ওগো সুখ, অপরূপ…

প্রস্তুতি

ধামসা-মাদল নিয়ে বাজন হাঁসদা আসে
পুরুলিয়া থেকে, ঝলমলে রাজধানী তাকাল সভয়ে।
কেন না দিনের আলো জানিয়ে দিয়েছে তাকে
রক্তে তার কোন খাদ নেই।

বিস্ময় ছড়ানো পথে, বাজনের চোখ তবু
সেদিকেতে নয়, সে দেখেছে রগরগে রোদে
কতটা ঝলসে ওঠে সিধু-কানু ডহরের মুখ।

ফিরে তাকে যেতে হবে—সেই ডেরা, যেখানে
সমস্ত দিন অন্ধকার, তবু দেয় সৈনিকের সাজ!
হোগলার পাতা ছিঁড়ে গনগনে সূর্যের আলো
শরীরে উত্তাপ দেয়, উনুনে ফুটন্ত ভাত—
গন্ধে তার দৃঢ় হয় জন্ম-অধিকার।

সঠিক মন্থন হলে

মাথার ওপরে নীল, যতদূর দেখা যায়
ধর্মনের মোহজাল, দেবতা-শূন্যতা থেকে
ইত্যাকার হাজার বিভ্রম।
অথচ পায়ের নিচে অনন্ত গহ্বর জুড়ে
বিদ্রোহের স্বাদ। কী যে ক্ষুধা, কী যে তৃষ্ণা!
মাংসল থাবায় বিদ্ধ যাবতীয় সুখ।
দেবতারা হার মানে, ধুলোমাখা মাটির পৃথিবী
রক্ত ঢালে মুমূর্ষুর দেহে, রমণীর ঠোঁট ভেজে
চুম্বনের স্রোতে।

কোথা সে অমৃতভাণ্ড! খা-খা করে মহাশূন্য
ইন্দ্রিয় যা নিতে পারে সব দেয় মাটির পৃথিবী।
দেবলোক ছেড়ে এসো, চেটেপুটে খেয়ে দেখো
সুধা না গরল
সঠিক মন্থন হলে ক্লেদ-সিক্ত নারীর জঘনে
ফুটে ওঠে পারিজাত, ঘাম-রক্ত পার হলে
বন্দরের কাল…

মুখোস

আগুনে ঝলসে গেছে কুসুমের মুখ, ঠাকুমার হাত থেকে
আঁকিবুকি তালপাখা, তাও ভেঙে খান খান!
ঘরে ঘরে বিষকুম্ভ, চারদিকে কালো ধোঁয়া—
শামুকের বুক চিরে আর কেউ আনে না বিস্ময়!

সকলে বদলে গেছি, সারি সারি ম্লান মুখ
জমানো যেটুকু সুখ, সবটুকু চেটেপুটে
কাঙালের হাল তবু, সাজানো হাসির ছটা
মুখোসের দুই ঠোঁটে।

এই ভাবে টিকে আছি, বোঝাপড়া ছলনায় প্রেমে।
বদলেছে সব তবু
কবিতার হয়নি মুখোস—
এখনও গুণ্ঠন তার মায়াবী বাতাস!

অপেক্ষা

রাস্তার এক পাশে বাউণ্ডুলে লোকটা শুয়ে আছে।
তার শতচ্ছিন্ন জোব্বার ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে আছে রহস্য
এবং সেখান থেকে সমানে বেরিয়ে আসছে দুর্গন্ধ।

ন'টা কুড়ির বর্ধমান লোকাল না এলে
তার কিছু যায় আসে না
যুবক হত্যার প্রতিবাদে দোকান-বাজার বন্ধ হলে
তার কিছু যায় আসে না
ভেজাল তেল খেয়ে এক হাজার লোক পঙ্গু হলেও
তার কিছু যায় আসে না

ময়দানের সাজানো মঞ্চে নেতারা যখন
দেশগঠনের ডাক দেয়
ও তখন দাড়িতে হাত বুলোয়
গভীর ঔদাসীন্যে পাশ ফিরে শোয়।
বিড় বিড় করে বলে—আজকাল মশারা যেন
বড় বেশি হিংস্র।
জোব্বার পকেটে হাত দিয়ে লোকটা অদ্ভুত ভাবে হাসে—
তার হাতে ঠেকে গাঁজার কল্কে, তাবিজ-কবজ
দুএকটা ঢাউস মাপের পুঁতি।

এতটা বয়স পর্যন্ত লোকটা কোনো রমণীর কাছে যায়নি
ওর জীবনের একমাত্র নারী তার মা।
সে হা-হা শব্দে হাসে, কাঁপিয়ে দেয় অট্টালিকার ভিত
ঋতুমতী মাটির সঙ্গে সে নিজেও অপেক্ষা করে আছে বর্ষণের।

একদিন

মেধায় আঘাত দিলে কবি।
আমি তো প্রতিরোধ করব না, চুরমার হব।
অভিশাপের ঝাঁপি খুলে দেখব
আশীর্ব্বাদ ছিল কি না।

তুমি দূরে যাবে, হয়তো বা আমিও।
অহংকার মাড়িয়ে যাবে লোকে
বলবে—দুটো মূর্খ এখানে তর্ক করত।

তারপর একদিন
এই সব ছেঁড়া কথা নিয়ে
প্রবাদের জন্ম হবে…

সুখদুঃখ

টিকে থাকার গোপন কৌশল জেনে
সকলেই ঠিকঠাক
কেউ কেউ বেঁচে থাকে, সুখের ঠিকানা নিতে
কেউ একা হেঁটে যায় সোহাগ-শর্বরী।

কেউ কি হারিয়ে যায়। পার হয়ে যায় কেউ।
দুঃখের গভীর হ্রদে সাহসী নাবিক—
গায়ে মাখা ঘাম-রক্ত, পাথরের বুকে আঁকা
আদিম মানব।

ছিঁড়ে যায় তন্তুজাল, চালচিত্র বেড়ে ওঠে উদাসী মায়ায়-
সুখ নামে ভালবাসি
দুঃখ হলে নীলনদী ভেসে যায় ভেলা…

মানুষের কাছে

এদিকে অশথ গাছ, ওপাশে বালির মাঠ—
মাঝখানে সারাদিন হেঁটে যায় সুখ-দুঃখ।
তারপর শুনশান, বিস্তীর্ণ পরিধি জুড়ে
রাত্রি পাতে আলখাল্লা, যাদুদণ্ড ছড়ায় রহস্য—
কিছু কিছু টুকরো তার হা-হা হি-হি প্রান্তরে গড়ায়

রাস্তার দুপাশে থাকা কত তুচ্ছ বড় হয়ে ওঠে।
ভাঙাবাড়ি কাছে আসে, অনর্গল কথা বলে—
জড়ানো গলায় তার এ পাড়ার নানান সংবাদ।
ধুলো ঝেড়ে পথ আসে, তারও রোমাঞ্চ আছে
দুচারটি সবুজ গাছ তার দুঃখে অংশ নিতে পারে।

একদিকে ছেঁড়া কাঁথা, তোবড়ানো ঘাটি-বাটি
গলাগলি খুনসুটি—দুমানুষে ঘুমোয় অঘোরে।
পথ ভাবে, রাত্রি ভাবে—ভাঙাবাড়ি, গাছ
মানুষের কাছে তারা এইভাবে অনিবার্য হারে…

আলাপ

অনেক দিন হল চাঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে।
যে চাঁদ অন্তরঙ্গ হাত বাড়াত, যে আকাশ
ঘুড়ি ওড়াত, যে পাখি হাততালি দিত

মরচে ধরেছে নাকি পায়ে! দোহাই ডাক্তারবাবু
আমার ক্ষতের দিকে মনোযোগ দেবেন না।
এখন ব্লাডসুগার হাইপার টেনসনকে বর্ণমালা মনে হয়

কী ভীষণ কাছের ছিল আবদুল মান্নান আনসারী!
তিরিশ বছর পরে তার কুণ্ঠিত প্রশ্ন—আমাকে ডাকছেন, বাবু?

দিন পাল্টাচ্ছে, আমিও সমানে খুঁজছি বৈঁচিগাছ
যেখানে চাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল…

বৃত্ত

উত্তর-চল্লিশে দেখি কিছু কিছু সমতলভূমি
ফেলে আসা দীর্ঘপথ, কাঁটা ঝোপ, ধূসর প্রান্তর
অগণিত চেনামুখ, কারো প্রেম, কারো বা অপ্রেম!
কেটেছে অনেক দিন, কৈশোর-যৌবন জুড়ে মোহময় রূপ
সেই জাল ছিন্ন করা আর এক পৃথিবী।

প্রিয় নারী নিয়ে গেছে গহন অরণ্যে—
চিনিয়েছে পত্রপুষ্প, পান্থপাদপ কোথা
ছেয়ে দেয় আস্তরণ,
সব দেখা! তবু সেই চাবি নিয়ে
ফিরে আসি রাজপথে—
সেখানে আর এক হাত, সুবিন্যস্ত আর এক অধ্যায়!
অথচ মন্ত্র নেই, শুধু সেই চাবি হাতে
ফিরে চাওয়া রহস্যের দিকে…

এখনও

আনলায় তোলা ছিল রোমাঞ্চের দিন ! সারি সারি
পর্বতের শিখা, বীরত্বের ছিলা থেকে ছুটে আসা
সুতীক্ষ্ণ ফলক ! কখনও নিশীথ-চেরা প্রথম সূর্যের আলো
দুচোখ ঝলসানো।

নীল মেঘে হাত রেখে মৃত্যুর তল্লাশ ! সেসব পুরোনো দিন—
অনুভব বলেছিল—তবে এই নদীতীরে সাজাবো বিছানা।
আর সব রঙিন পাখিরা নাকি করেছিল বিজয়-উৎসব—
তার কিছু পালকের গায়ে কম্পিত হাতের ছোঁয়া, অভিমান…

এখনও বিবর্ণ ছায়া ! এখনও হীরক-দীপ্তি !
মখমল জড়ানো সেই তলোয়ার থেকে
প্রসারিত উজ্জ্বল সময় ! দেওয়ালে মুখোস থেকে
অবিকল সেই গন্ধ—বিরল পৌরুষ !

ইতিহাস

কেউ লেখে না ইতিহাস, ইতিহাস অক্ষর বাছে নিজের বিচারে।
যে পাথর কেটে নাম লিখতে চেয়েছে,
সে জানতো না বাতাস তার শত্রু হবে
যে আত্মগোপন করতে চেয়েছে
তাকে চিনিয়ে দিয়েছে ভালবাসা।
এখনও দীপ্তভাবে হেঁটে যায় দার্শনিক
মৃত্যুর নীলমুদ্রা তাকে স্তব্ধ করতে পারেনি,
যীশুর কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে রক্ত
ভেরোনিকার লজ্জাবস্ত্র মুছিয়ে দিয়েছে গভীর প্রেমেতে!

কত যুদ্ধ, অভিযান, তবু আলেকজাণ্ডারকে ফিরিয়ে দিয়েছে ডিওজিনিস
দোহাই তোমাকে, সূর্যালোকের পথ থেকে তুমি সরে দাঁড়াও!
এখনও রোম নগরীর বাতাসে অস্ফুট সন্দেহ—ব্রুটাস, তুমিও নিষ্ঠুর!
ক্লিয়োপেট্রা, তোমার বামগণ্ডের তিলটি না থাকলে
হয়তো অনেক প্রাণ বাঁচত,
কিন্তু কবি কোথায় পেত এমন অহংকার!

কে চেয়েছে লোরকার মৃত্যু! লোহার খাঁচার মধ্যে হেসে ওঠে এজরা—
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে!
মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছে থিওডোর
ওর হাতেই উন্মুক্ত হবে জীবনের বিশুদ্ধ প্রহর!
সরোবরে চাঁদের ছায়া দেখে অগাধ সৌন্দর্যের অভিসারে
নেমে গেছে লী-পো—
রেলস্টেশনে ক্লান্ত কিশোর এসে অসাধ্য সাধনের গৌরবে
মাথা রাখে দেশের মাটিতে,
ধ্যানমগ্ন তথাগত, অফুরন্ত পরমায়ু
ঝরে পড়ে ধূসর জীবনে।
হিটলারের ভ্রূকুটির দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছে শিল্পী—
গোয়েরনিকার ছবি, পাহাড়ের অন্তরালে কে লুকিয়ে রাখে ভালবাসা
গোপন রহস্য জানার অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়েছে ইতিহাস

অন্ধকারে

বাগানের পাশে একটি কাঁঠাল গাছ। অন্ধকারে
হাতছানি দেয়, সে রাত জেগে তারা দেখে
প্রত্যহ অতিথি তার জোনাকিরা আলো নিয়ে আসে।

ওর দিকে তাকিয়ে আমি আনমনে হাত বাড়াই—
হাত ডুবে যায় অন্ধকার অতীতে, সেখানে দাঁড়ানো দেখি
একটি বালিকা, তার কোঁচড়ে রাতের বকুল ফুল।

অন্ধকারে হাত ভিজে যায়। ভেজা হাতে অভ্যর্থনা করি
বিস্মৃত অনুভূতিমালা,
ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি এক আশ্চর্য কোলাজ!

আমি অন্ধকারে আলো দেখি, সেই আলো—
যা আমাকে আলোর মধ্যেই ছলনা করে!

মুক্তিস্নান

উন্মুক্ত হও, অন্তত নিজের কাছে খুলে দাও
এই দেহ, এই দাহ, মর্মমূলে তুমুল সংঘাত—
বিস্মিত ছায়ায় দেখো কত পাপ, কত গোপনতা
কী করে ডিঙিয়ে যাবে এমন সহজে !
পাপ সে তো পুণ্য হয় যদি বয় বিশুদ্ধ বাতাস
নীল জলে ধুয়ে যায়, ভ্রষ্টা নারী ফিরে পায়
জননীর বিমূর্ত প্রতিমা

চলো যাই, কে কে যাবে ! সমবেত মর্ত্য-অভিযানে
পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে এই ব্রত
সকলে ভাসব উজানে…

অনিদ্রা

আমার দিদিমা পুতুল-বৌ গড়তেন। তাদের তিনি
প্রাণ দিতে পারতেন না, কিন্তু টানা টানা চোখ দিতেন
নাকে নথ, সিঁথিতে সিঁদুর—
সমস্ত ঘর জুড়ে তারা ঝম ঝম করত
আর মধ্যরাতে নেমে আসত আমার কাছে।
পেখম নাচিয়ে বলত—এসো আমার সঙ্গে
আকাশের তারা গুনি—

ঘুম ভেঙে গেলে দিদিমাকে বলতাম—
তিনি আমার বুকে হাত রেখে
পাশ ফিরে শুতে বলতেন।

বহুদিন পরে আবার পুতুলদের সঙ্গে দেখা।
ইতিমধ্যে দিদিমা চলে গেছেন, আমার চশমাও ঝাপসা!
আমি প্রথমে চিনতে পারিনি—ওরা আর পেখম মেলে না
বিষণ্ণ মলিন বেশে মধ্যরাতে কেঁদে বেড়ায়—

আমারও অস্থির চোখে ঘুম নেই, শোকাচ্ছন্ন তোশক-বালিশ

বিশল্যকরণী

প্রবীণেরা এক মত, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।
প্রৌঢ়ের মলিন চোখে তবু দ্বিধা, পুরোনো বিস্ময়!
ভ্রান্ত যুবক দেখে অন্ধকার, লকলকে কেউটের জিভ
বিষে বিষে নীল হয়ে কেঁপেছে রমণী!

বৃথা সব অশ্রুপাত—ঝাড়ফুঁক, শান্তিস্বস্ত্যয়ন
এমনি করেই যেন কেটে যাবে দিন, সুখস্মৃতি!
অথচ গোপন পথে উঁকি দেয় কম্পমান আলো
নীলপরী নেমে আসে, সারা গায়ে গন্ধ তার
ছুঁয়ে যায় চিবুক-ললাট, সবুজ পাতার নিচে
মুখরিত খেলাঘর, প্রিয় কবিতার ছায়া
অমলা কিশোরী—

গরল নেমেছে হে!
বিশল্যকরণী আছে আমাদের হাতেই লুকোনো!

কবির মৃত্যুতে

এখনও গড়িয়ে পড়ে গোপনে হিমের রেখা
কার্তিকের ভোরে, এখনও নিথর রাত
চুপি চুপি খুলে দেয় রহস্যের চাবি—
এখনও প্রখর স্রোত, ছোট বড় নানা বৃত্ত
হাওয়ার মোরগ ঘোরে সময়ের টানে !

সব কিছু ঠিক ঠাক, তবু কেউ উঠোন পেরিয়ে
এই তো সে চলে গেছে, শিশিরে ভেজানো ঘাস—
মাড়িয়েছে বেলাভূমি, পদচিহ্নময় !

পৃথিবীর খেলাঘরে সব কিছু পড়ে আছে—
তেমনই তা পড়ে থাকে ! কেউ যেতে পারে না তো
রমণীর ঠোঁট থেকে দিগন্তের পারে
টানা এক সীমারেখা—সেই দুঃখ, সেই সুখ
চোখের আড়াল·

স্বর্গ কি অনেক দূর

পাঁক দেখে চমকাবে না, কি হবে, ওপরে তো শতদল আছে
যে পাখিরা নর্দমায় চান করে, ওদের দেখো
অরণ্যের ডালে বসে কী মধুর গান গায়!
তখন হয়তো অর্ফিয়ুসের কথা মনে পড়ে।
গুবরে পোকা ঘাসে ঘাসে মুখ লুকোলে কি হবে
চাতক পাখির সঙ্গে সেও দেখো হাসতে হাসতে স্বর্গে যায়!

মানুষে মানুষে সংঘাত হানাহানি, চিৎকার-ধর্ষণ
তরুণী বালিকার পবিত্র গালেও দাগ দেখো হিংস্র নখের
কিন্তু সেটাই তো সব নয় ভাই—
কেরানী-খুনী-দ্বারোয়ান-পকেটমার সকলেই ঘরে ফিরে
দেখো ভালবাসার কাছে কেমন পোষ মানে!
বিশ বছরের কয়েদ-ফেরৎ লোকটাকে দেখো—
কী গভীর আগ্রহ তার! আত্মজকে বুকে তুলে নাচে
অথচ গর্ভবতী বৌকে মেরেই লোকটা জেলে গেছল।

আহা! আহা! শবযাত্রার কচি মেয়েটাকে দেখো
অহল্যা যেন পাষাণ হবে কেঁদে কেঁদে!
কিন্তু তাই কি কখনও হয়
পুরোনো পাঠশালার অলিন্দে যে অপেক্ষা করে আছে
ভালবাসা! হাতছানির জন্য বেকার যুবক
উদ্বেল প্রহর ছিঁড়ছে নখ দিয়ে।
কে গেছে ওই অরণ্যে! সবুজ মাটির বুকে
কে এঁকেছে দেশমাতার ছবি!
কার ভরাট কণ্ঠ শুনে কেঁপে ওঠে গুহাবন্দী বাঘেরা!
বুক চিরে রক্ত দিয়ে কে এসে বলে গেছে
তোমাদের তামাদি সুখের জন্য অবসর এনে দেবো
প্রত্যেকের ঠোঁটে!
ক্ষিপ্রতায় ছুটে গেছে পুলিশ, দেশদ্রোহী দেশবাসী
দুহাতে ঘৃণা মেখে আদায় করে নিয়েছে বসবাসের ঘরবাড়ি

নারীমাংস ছিঁড়ে কে এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায় !
কার রক্ত এই হিমশীতল শহরের পাঁজরে পাঁজরে
বয়ে গেছে নরম সোহাগে !
জানলা বন্ধ করে দাও—
অন্ধকার প্রহর জুড়ে হৃদপিণ্ড
ডিম-ডিম-ডিম-ডিম কে বাজিয়ে গেল দামামা !
ওরে হতভাগা, তুই পথভ্রষ্ট
তোকে ঘরে রাখার জন্যে ভালবাসা বয়ে গেছে
উদ্দাম নদীর ঢল
আস্তাবলে শুয়ে আছে ফুটফুটে শিশু—
কোমল মুঠোতে তার পৃথিবীর আলো
সেই প্রেমে একাকার, বিপ্লবী সন্ন্যাসী হয়,
লম্পট প্রেমিক—

এত যে দূষণ তবু বাতাসে ভাসছে ভালবাসার গন্ধ
তারই মধ্যে আমি ঘ্রাণ নিচ্ছি নিবিড় পৃথিবীর
ফেটে পড়ছে ক্ষোভ, হয়তো বা অভিমান
আমার স্বাধীনতার বরাদ্দ কমছে আশ্চর্যভাবে !
দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ, প্রখর সূর্যালোকে
একে একে ফাঁস হয়ে গেছে সম্পর্ক, কোনো অজুহাত নেই
অপ্রেম বড় নির্মম, তার ঝলসানো তরবারি, শাণিত কৃপাণ
কোথায় আশ্রয় পাবে ! অথচ আশ্চর্য কাণ্ড
ঠাকুমার ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে আসে ভালবাসা !
পুরোনো সম্পর্ক টেনে এখনও বন্ধুরা আসে
কী অসহ্য টানাটানি !
কিছু কিছু কবি তবু এনে দেয় হলাহল
ভৃঙ্গার উল্টে দেখি আশ্চর্য ভাণ্ডার তার ! চুয়ে চুয়ে রস পড়ে
বোমা বারুদের দিন থাক না সাজানো পটে
তার চেয়ে খুলে দেখি শৈশবের ছবি !

পঞ্চাশ পেরোলে যিনি বানপ্রস্থ বেছে নেন, তিনি কিন্তু কবি নন
অরণ্যের দাবানল শুধু তো শুকনো পাতা

কোথা পাবে হৃদয়ের সীমা ।
দগ্ধ হোক মন-প্রাণ, বিস্ময় সারাবে ব্যাধি কবিতার ছায়া
খুঁজে ফিরি স্নিগ্ধ পথ বটতলা জুড়ে আছে বালিকার স্মৃতি
এখানে বাঁচতে পারি, এখানে প্রশ্বাস আছে
হোক না পৃথিবী ক্লান্ত, জননীর নাভিকুণ্ড
অবিরাম ধারা তার সতত সঞ্চারী ।
অভিধান থেকে যদি প্রেমহীন সব শব্দ তুলে দেওয়া হয়
পুষ্পকে কাতর কণ্ঠে বলা যায় —তুমি শুধু অমলিন থাকো
ঝর্না-নদীর মত চিরদিন বন্ধাহীন
তবে কেন এই ক্ষোভ ! বিধিবদ্ধ অভিমান
এসো না উত্তপ্ত করি মলিন সূর্যকে ।

সামনে প্রশস্ত পথ, আদিগন্ত হাতছানি
কে এসে এগিয়ে দেবে ! সে কি তুমি, প্রেমময়ি !
আলোয় ধুয়েছি মাঠ, এসো হাতে হাত রাখো
পায়ে পায়ে হেঁটে গেলে স্বর্গ কি অনেক দূর হবে !

দর্পণে নিজের মুখ

দর্পণে নিজের মুখ চেয়ে দেখি বহুদিন পরে
স্বপ্ন-ধোওয়া দুই চোখ।   চিবুক নুয়েছে ভারে সময়ের টানে
কপালে বিষণ্ণ খাঁজ, তবু যেন চেনা চেনা লাগে।

শেষ দেখা ফুলবনে কবে সেই কতকাল আগে!
ঝাউ গাছ দূরে ছিল, চোখ ছিল পলাশের ডালে।
তারপর পথ হাঁটা—একটানা বসে থাকা
কী যে পাব কার কাছে জানি না এখনও।

দর্পণে নিজের মুখ চেয়ে দেখি বহুদিন পরে
আগ্রহে কুশল জানি—এত দিন কেমন ছিলেন।
আজও কি রয়েছে দৃষ্টি স্থির লক্ষ্যে, পলাশের ডালে…